রোহিঙ্গা সমস্যাঃ প্রেক্ষিত, বর্তমান পরিস্থিতি আর সম্ভাব্য করণীয়

আলী ইমাম মজুমদার, সাবেক মন্ত্রিপরিষদ সচিব ও নির্বাহী সদস্য, সুজন–সুশাসনের জন্য নাগরিক

ভূমিকা

শুরুতেই আমরা নরওয়ের রাজধানী অসলোতে ২০১২ সনের ১৬ জুন অনুষ্ঠিত নোবেল পদক বিতরণ অনুষ্ঠানে ১৯৯১ এ শান্তিতে এ পুরস্কার পাওয়া আজকের মিয়ানমারের নেতা অং সান সুচির বক্তৃতার অংশ বিশেষ আলোচনা করবো। তিনি বলেছিলেন:

বার্মা বহু নৃ-গোষ্ঠী ও ধর্ম বিশ্বাসের একটি দেশ। তার ভবিষ্যতের ভিত্তিও হতে হবে এদের ঐক্যবদ্ধ করার চেতনা। কিন্তু ১৯৪৮ সনে আমাদের স্বাধীনতা অর্জনের পর থেকে গোটা দেশে শান্তি বিরাজমান এমন একটি সময় ছিল বলে আমরা দাবি করতে পারি না। বিরাজমান দ্বন্দ্ব অবসানের জন্যে আমরা বিভিন্ন গোষ্ঠীর মাঝে পারস্পরিক বিশ্বাস ও সমঝোতা করতেও সক্ষম হইনি।

তিনি আরও বলেছিলেন–

স্থানচ্যুত, গৃহচ্যুত এবং আশাহীন মানুষের হয়ে মুক্ত একটি বিশ্ব গড়ে তোলার জন্যে আমরা কাজ করবো। আমরা কাজ করবো, পৃথিবীর সকল প্রান্তকে নিরাপদ করে সেখানে বসবাসকারী মানুষ সত্যিকারের স্বাধীনতা নিয়ে যাতে বসবাস করতে পারে সে লক্ষ্যে। আমরা প্রত্যেকেই কিন্তু এরূপ করায় অবদান রাখতে পারি। আসুন, আমরা হাতে হাত মিলিয়ে এমন একটি বিশ্ব তৈরি করি, যেখানে নিরাপদে ঘুমোতে পারি আর জেগে উঠি আনন্দের সাথে।

সেদিনের অং সান সুচি এখন মিয়ানমারের নির্বাচনে নিরঙ্কুশ বিজয়ী দল 'ন্যাশনাল লিগ ফর ডেমোক্রেসি'র প্রধান নেতা। তিনি সরকারের স্টেট কাউন্সিলর পদেও রয়েছেন। ১৯৮২ সনের নাগরিকত্ব আইনের কুটচালে প্রেসিডেন্ট হতে পারেননি। আর সে আইনেই নাগরিকত্ব কেড়ে নেয়া হয় রোহিঙ্গাদের। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে অং সান সুচি এ অন্যায়ের বিরুদ্ধে একটি কথাও বলেননি। তিনি সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী নন এটা আমরা জানি। কিন্তু তিনি তো দেশটির নির্বাচিত নেতা। দীর্ঘকাল গৃহবন্দী থেকে স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে যখন তিনি লড়াই করছিলেন, তখন গোটা গণতান্ত্রিক বিশ্বের শান্তিকামী মানুষের সমর্থন ছিল তাঁর প্রতি। আর আজ দিচ্ছে ধিক্কার। দুঃখজনক হলেও এটাই স্বাভাবিক। অসলো-তে শান্তির জন্যে নোবেল পুরস্কার নিতে গিয়ে যে কথাগুলো বলেছেন তার ছিটেফোঁটাও কি দেখা যাবে এখনকার রাখাইন রাজ্যের মংডু, বুথিডং এবং রাথিডং-সহ রোহিঙ্গা অধ্যুষিত এলাকায়? এ আলোচনা করবেন উপস্থিত সুধীজন।

সমস্যাটির সূচনা বার্মা বৃটিশ শাসনমুক্ত হওয়ার পর থেকেই। অথচ সেদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে বার্মিজ নেতৃবৃন্দের কাতারে মুসলমানেরাও ছিল। ছিল রোহিঙ্গারা। আর রোহিঙ্গারা বাংলাদেশ থেকে রাখাইন রাজ্যে গিয়ে বসবাসকারী কেউ নন। ষোড়শ শতাব্দির আগে থেকেই তারা সেখানে বসবাস করছে বলে প্রামাণ্য দলিল আছে। ছিল নাগরিকত্ব ও ভোটাধিকার। এমনকি আশির দশকে অং সান সুচির দল আরেক বার যখন নির্বাচনে যেতেন তখনও তারা তাকে ভোট দেয়। কয়েকজন এমপিও হন রোহিঙ্গাদের মধ্য থেকে। তবে সে নির্বাচনকে বাতিল করে দেয় একনায়ক শাসকরা। এখন যারা রোহিঙ্গা নিধন কার্যক্রম চালাচ্ছে, অং সান সুচি কার্যত তাদেরই মুখপাত্র বলে মনে হচ্ছে। প্রতিবাদী বিশ্বকে বিভ্রান্ত করতে দু'এক বার বক্তব্য রেখেছেন। গত ১৯ সেপ্টেম্বর বলেছেন, রোহিঙ্গাদের তিনি ফিরিয়ে নিবেন। কেন তারা গেল তাও দেখা হবে খতিয়ে। এ ভাষণের পরও এক লাখের বেশি রোহিঙ্গা এসেছে বাংলাদেশে। আর সে ঢল এখনও চলমান। পাঁচ লাখ ছাড়িয়ে গেছে বেশ আগে। বক্তব্যের সারবত্তা থাকলে অন্তত তিনি দেশত্যাগ দ্রুত বন্ধ করে একটি আস্থার পরিবেশ সৃষ্টি করতে সচেষ্ট হতেন। সদিচ্ছার অভাব বা অক্ষমতা যাই হোক তাঁর বক্তব্য খুব গুরুত্বের সাথে নেয়া দুরুহ। অবশ্য তিনি তাঁর সরকারের একজন মন্ত্রীকে পাঠিয়েছেন এদেশে একই আশ্বাস-সহ। সে মন্ত্রীর এদেশে ২৪ ঘণ্টা অবস্থানকালেই পাঁচ হাজার রোহিঙ্গা প্রবেশ করেছে। গত ২৫ আগস্ট থেকে যেসব রোহিঙ্গা বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে তাদের শরণার্থী বলা হচ্ছে না। বলা হচ্ছে রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশকারী। ঠিক তেমনিভাবে টেকনাফ উপত্যকায় আগে থেকেই রয়েছে ১৯৯২ এ আসা ৩০ হাজার রোহিঙ্গা শরণার্থীর দুটো শিবির। আরও আছে বিভিন্ন সময়ে এ উপত্যকায় এসে বসবাস করা অনিবন্ধিত ৭০ হাজার রোহিঙ্গা। ধারণা করা হয়, বিভিন্ন সময়ে এসে জনগণের মাঝে মিশে গেছে তিন লাখের মত। অন্য দু'বারের চেয়ে এবার এসেছে সংখ্যায় অনেক বেশি। এর মাঝে রয়েছে পাঁচশত হিন্দু।

কেন তারা আসে

শত শত বছর ধরে বংশানুক্রমে তারা শান্তিতে বসবাস করছিল রাখাইন রাজ্যে। এককালে রাজ্যটির নাম ছিল আরাকান। ১৯৭৮ এবং ১৯৯২ সনে দু'বার প্রায় তিন লাখ করে রোহিঙ্গা বিতাড়িত হয়েছিল রাখাইন রাজ্য থেকে। প্রথম দফার সকলকে ফেরত দেয়া গেছে দু'বছর চেষ্টায়। দ্বিতীয় দফায় আসা ৩০ হাজার এখনও শিবিরবাসী। রোহিঙ্গারা সব সময়ই আসে নানামুখী নির্যাতনের শিকার হয়ে। হত্যা, মারধর, নারীদের সম্ভ্রমহানি, জমি ও সম্পদ কেড়ে নেয়া-সহ বিভিন্ন ধরনের মানবতা বিরোধী অপরাধের শিকার তারা। সেখানে তাদের গতিবিধি অত্যন্ত নিয়ন্ত্রিত। ফলে জীবিকা অর্জনের পথ খুবই সীমিত। শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসুবিধা থেকে বঞ্চিত। জনবহুল সমস্যা জর্জরিত বাংলাদেশের সীমানায় রাখাইন রাজ্য। তাই বিপদে পড়লেই এদিকে দৌড়ায় রোহিঙ্গারা। শত প্রতিকূলতার মাঝেও প্রাণ ভয়ে পলায়ন পর মানুষকে আমরা আশ্রয় না দিয়ে পারি না। তাই এদের ভার আমাদের নিতে হয়েছে। অবশ্য এ মানবিক কাজের জন্যে বিশ্ব সমাজে প্রশংসিত হচ্ছি আমরা। পাওয়া যাচ্ছে কিছু বৈষয়িক সহায়তা। জাতিসংঘের অঙ্গসংস্থা ইউএনএইচসিআর, ডব্লিউএফপি ও আইওএম রয়েছে আমাদের সাথে। রয়েছে আরও অনেক সংস্থা।

প্রশ্ন আসে মিয়ানমার তাদের কেন নিষ্ঠুরভাবে দেশ ছাড়া করল? এবারে দোষ দেয়া হচ্ছে আরাকান রোহিঙ্গা সেলভেশন আর্মির (আরসা) নেতৃত্বে কিছুসংখ্যক রোহিঙ্গা ২৫ আগস্ট কয়েকটি সেনা ক্যাম্প ও সীমান্ত চৌকিতে হামলা চালায়। বলা হয়, এ জনগোষ্ঠী সন্ত্রাসী কার্যক্রমের সাথে জড়িত। তাই এ সেনা অভিযান। যদি রোহিঙ্গাদের কেউ অপরাধ করেও থাকে তাহলে সেদেশের আইন অনুসারে তাদের

বিচার হতে পারে। বেসামরিক জনগণের সাথে শক্তি প্রয়োগের মাত্রাটিতো যুদ্ধ পরিস্থিতির মতই মনে হয়েছে। অনেক বিজ্ঞজন এর কারণ বিভিন্নভাবে বিশ্লেষণ করেন। কারও মতে, চীন ও ভারতের মিয়ানমারে ব্যাপক বিনিয়োগ আছে। রাখাইন রাজ্যে হবে বেশ কিছু শিল্পাঞ্চল। আকিয়াবে একটি গভীর সমুদ্র বন্দর নির্মাণে চীনের আগ্রহ ও প্রস্তুতির কথা জানা যায়। আর রাশিয়ার রয়েছে মিয়ানমারের কাছে ব্যাপক অস্ত্র বিক্রির ব্যবসা। রাখাইন রাজ্যে সন্নিহিত সাগর বেলায় হাইড্রো কার্বনের ব্যাপক উপস্থিতি সম্পর্কে কেউ কেউ বলে থাকেন। এর সবগুলোও যদি সত্যি বলে ধরা হয় তবে মাত্র দশ লক্ষাধিক রোহিঙ্গাকে সেখান থেকে বিতাড়নের কোনো কারণ থাকে না। এত বড় দেশ মিয়ানমার। জনসংখ্যার ঘনত্ব অনেক কম। রাখাইন রাজ্যেই তাদের অন্যত্র স্থানান্তর সম্ভব হত। প্রকৃতপক্ষে এটা জাতিগত নিধনযজ্ঞের একটি অংশ। তবে দুর্ভাগ্যজনকভাবে এটি সরাসরি সমর্থন করছে চীন ও রাশিয়া। আর ভারত বাংলাদেশে আগত রোহিঙ্গাদের মানবিক সহায়তা দিলেও এ অমানবিক কার্যক্রম থামাতে কোনো উদ্যোগ নেয়নি। বরং চার বছর আগে সে দেশে আশ্রয় নেয়া ৪০ হাজার রোহিঙ্গাকে এ জলন্ত পরিস্থিতিতে বিতাড়ণের পদক্ষেপ নিয়ে কার্যত নিজেদের অবস্থানকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে। তবুও আমরা আশা করবো, এ দেশগুলোর যত স্বার্থই মিয়ানমারের থাকুক তারা হতভাগ্য রোহিঙ্গা নিধন বন্ধ ও তাদের দ্রুত ফিরিয়ে নেয়ার পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে কার্যকরি প্রভাব রাখতে পারে। বাংলাদেশে নিযুক্ত চীনের মান্যবর রাষ্ট্রদূত যখন কক্সবাজার থেকে অন্য কূটনীতিকদের সাথে সফর করে এসে বলেন এদেশে আসা রোহিঙ্গাদের এখন সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন তাবু ও কম্বল, তখন আমরা সত্যিই ব্যথিত হই। প্রকৃতপক্ষে তাদের সর্বাগ্রে প্রয়োজন মিয়ানমারের নাগরিত্বের স্বীকৃতি ও স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের নিরাপদ ও সম্মানজনক ব্যবস্থা। তবে জাতিসংঘ-সহ ইউরোপের রাষ্ট্রগুলো, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া ও তুরস্ক এসব দেশ রোহিঙ্গাদের পক্ষে সোচ্চার। তবে সৌদি নেতৃত্বাধীন মুসলিম দেশগুলো প্রতিবাদী হলেও কণ্ঠস্বর অজ্ঞাত কারণে অনুচ্চ। জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে ভাষণ দিতে গিয়ে আমাদের প্রধানমন্ত্রী জোরালোভাবে সমস্যাটি ও এর সম্ভাব্য সমাধান তুলে ধরেন।

আগত রোহিঙ্গা ব্যবস্থাপনা

আসলে আমরা অপ্রস্তুত ছিলাম। আর স্বাভাবিক বিবেচনায় তাই থাকার কথা। কিন্তু রাখাইন রাজ্যে ২৫ আগস্টের আগে দুই ডিভিশন সেনা আনয়ন-সহ তাদের গোপন প্রস্তুতির দিকে নজর রাখা আবশ্যক ছিল। আকিয়াবে তো আমাদের একটি উপ-দূতাবাসও আছে। ঘটে যাওয়া পরিস্থিতি সম্পর্কে আমাদের কোনো সংস্থাই সরকারকে আগাম তথ্য দিয়েছে বলে জানা যায় না। এমনকি ঢাকার একটি ইংরেজি দৈনিকে অভিযোগ এসেছে, জাতিসংঘ অনেক আগে থেকেই বিষয়টি আঁচ করতে পেরেছিল। কিন্তু তেমন কোনো ব্যবস্থা নেয়নি। আর এখনও নিশ্চিত করে বলা যাচ্ছে না শেষ পর্যন্ত কত রোহিঙ্গা এদেশে আসবে। তাই তাদের নিবন্ধন, আশ্রয় শিবির নির্মাণ, ত্রাণ কার্যক্রম প্রাতিষ্ঠানিকরণ, পয়ঃনিষ্কাশন, পানি সরবরাহ ও চিকিৎসা ইত্যাদি শুরুতেই বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখা দেয়। একেবারে সূচনায় বিচ্ছিন্নভাবে ত্রাণ কাজ পরিচালনা করা হয়েছে। এছাড়া উপায়ও ছিল না। বিভিন্ন এনজিও, ব্যক্তি বা সংগঠনও তাই করেছে। এ অবস্থায় সেনাবাহিনীকে শিবির নির্মাণ ও ত্রাণ বিতরণ কাজে সমন্বয়ের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। জানা যায়, এ পর্যন্ত বন বিভাগের ৩ হাজার একর জমির উপর আশ্রয় কেন্দ্র ও সংযোগ সড়ক নির্মিত হচ্ছে। বিভিন্ন সংস্থার বহু কর্মকর্তা কাজ করছেন এগুলোতে। ধীরে ধীরে নিয়ন্ত্রণে আসলেও সমস্যা বহুমাত্রিক। এসব সমস্যাদির মাঝে আছে:

ক) এত ব্যাপকসংখ্যক লোকের বায়োমেট্রিক রেজিস্ট্রেশন। এটা যথেষ্ট সময় নেবে। দ্রুততার জন্যে অধিক জনবল ও যন্ত্রপাতি পাঠানোর ব্যবস্থা নিলে ভাল হয়।

খ) নিরাপদে ঘুমানোর মত একটি জায়গা করে দিতে সময় লাগলেও এর বিকল্প নেই। তবে একটিমাত্র শিবিরে সকল আগত রোহিঙ্গাকে আশ্রয় দেবার ব্যবস্থাটি কিছুটা প্রশ্নবিদ্ধ হচ্ছে। এতে ছোঁয়াচে রোগ দ্রুত বিস্তারের আশঙ্কা থাকে। উল্লেখ্য, আগের দুই দফায় ১৩ থেকে ১৫টি শিবিরে ভাগ করে রাখা হয়েছিল রোহিঙ্গাদের।

গ) মিয়ানমারে বিশেষ করে রাখাইন রাজ্যে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবার ব্যবস্থা নিম্নমানের। আগত রোহিঙ্গাদের মাঝে অনেকে ছোঁয়াচে রোগে আক্রান্ত। জটিল রোগ ব্যাধিও রয়েছে অনেকের। এদের নিবারণমূলক টিকা, ইনজেশন দেয়া এবং রোগাক্রান্তদের চিকিৎসার ব্যবস্থাও চালিয়ে রাখতে হবে। এটি যাতে ছড়িয়ে না পড়ে সেজন্য আবশ্যক সতর্কতা।

ঘ) কয়েক হাজার শিশু-কিশোর পিতৃ-মাতৃহীনভাবে এদেশে আশ্রয় নিয়েছে বলে জানা যায়। তাদের দেখভালের জন্যে একটি ভিন্নতর ব্যবস্থাপনা না থাকলে সুযোগ সন্ধানীরা বিপথে পরিচালনা করতে সচেষ্ট হবে। আগত অসংখ্য নারী ও শিশুর নিখোঁজ হওয়া এবং পাচারকারীদের তৎপরতার খবর ইতিমধ্যেই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে।

ঙ) প্রচুর অন্তঃসত্ত্বা নারী এসেছে আশ্রয়ের সন্ধানে। তাদের অনেকের স্বামী নিহত বা নিখোঁজ। অন্তঃসত্ত্বা নারীদের নিরাপদ সন্তান প্রসব ও সম্ভাব্য সেবা যত্ন অগ্রাধিকারে রাখা দরকার।

চ) অনেক আহত ও রোগাক্রান্ত রোহিঙ্গার চিকিৎসা চলছে। সেটা চলমান ও জোরদার করা দরকার।

ছ) রেশন ব্যবস্থা চালুর জন্যে নিবন্ধন অত্যাবশক হলেও অন্তর্বর্তীকালীন কোন ব্যবস্থায় তা চলছে তা আমরা অবগত নই। রান্নার জ্বালানি সরবরাহ করা না হলে বন-বাদাড় উজাড় হয়ে যাবে। পুষ্টিহীনতা তাদের একটি বড় সমস্যা। এটা মোকাবিলা করতে বিশ্ব খাদ্য সংস্থা ও রেড ক্রিসেন্ট-এর পক্ষ থেকে পদক্ষেপ জোরদার করা আবশ্যক।

জ) শিবিরবাসীরা বন্দী না হলেও ভিন দেশের নাগরিক। মর্যাদা ও দরদের সাথে রাখা হয়েছে তাদের। তবে দেয়া যাবে না ছড়িয়ে পড়তে। এরজন্যে একাধিক স্তরবিশিষ্ট নিরাপত্তা ব্যবস্থা দরকার।

ঝ) কোনো অবস্থাতেই যাতে এসব রোহিঙ্গা সন্ত্রাসমূলক কোনো কাজ কিংবা চোরাচালানির সাথে যুক্ত হতে না পারে তার জন্যে নিবিড় নজরদারির ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। দেশি-বিদেশি কোনো ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে আমাদের এ প্রিয় দেশটির এ সুন্দর অঞ্চলটি যেন সন্ত্রাসী অধ্যুষিত বলে আখ্যায়িত না হয়। ইতিমধ্যেই বাংলাদেশে আগত রোহিঙ্গাদের মধ্যে ইয়াবা ব্যবসায় জড়িত হওয়ার খবর প্রকাশিত হয়েছে পত্রিকায়।

ঞ) অন্য ধর্ম ও সম্প্রদায়ের লোকজনের নিরাপত্তা যাতে কোনো অবস্থাতেই রোহিঙ্গাদের দ্বারা বিঘ্নিত না হয় সেদিকে কঠোর অবস্থান নিতে হবে। পার্বত্য চট্টগ্রামের খুব কাছাকাছি শিবিরের অবস্থান। সেটি আমাদের জন্যে একটি স্পর্শকাতর অঞ্চল। রোহিঙ্গারা কোনো অবস্থাতেই যাতে সে অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়তে না পারে তা নিশ্চিত করা আবশ্যক।

তাদের কি হবে

লাখো কথার এককথা এটাই। আমাদের জনবহুল দেশটি কি তাদের স্থায়ীভাবে নিয়ে নেবে? এরূপ ভাবনা একেবারেই অসঙ্গত। রোহিঙ্গাদের পক্ষে যে বিশ্ব জনমত তাকে কাজে লাগাতে আমাদের সক্রিয় ও বিরামহীন প্রচেষ্টা নিতে হবে। যারা মিয়ানমারকে এ নিধনযজ্ঞে সক্রিয় বা নিরবে সমর্থন করছে আমাদের প্রতিও তাদের দায়বদ্ধতা আছে। এটা কুটনৈতিক চ্যানেলে তুলে ধরতে হবে বারংবার। আর যারা রোহিঙ্গাদের সর্মথনে আছে তাদের আরও গতিশীল উদ্যোগ নিতে অনুরোধ জানাতে হবে নিয়ত। যারা ক্ষীণ কণ্ঠে সমর্থন জানাচ্ছে তাদের কণ্ঠস্বরকে সোচ্চার করতেও প্রচেষ্টা চালানো দরকার। মিয়ানমার সরকারই গঠন করেছিল কফি আনান কমিশন। সে কমিশনের সুপারিশেই রয়েছে এর সমাধানের ইঙ্গিত। আমাদের প্রধানমন্ত্রী জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে ভাষণ দিতে গিয়ে মূলত এর উপরেই জোর দিয়েছেন। সে কমিশনের সুপারিশ অনুসারে রোহিঙ্গাদের নাগরিকত্ব এবং মিয়ানমারের আইন অনুযায়ী বাধাহীন চলাচলের অধিকার দিলে সমস্যার মূলে হাত পড়বে। এ আইন কাজ একটু সময় নিলেও নীতিগত স্বীকৃতি দ্রুতই দেয়া যায়। এখনও যেসব রোহিঙ্গা মিয়ানমারে রয়ে গেছে সদিচ্ছার নিদর্শন হিসেবে তাদের দেশত্যাগ বন্ধ করা যায়। মিয়ানমার সরকার তাদের শান্তি, নিরাপত্তা ও মর্যাদা নিশ্চিত করে এ ব্যবস্থা নিতে পারে। তাদের জীবনধারণের বাধাগুলো অপসারণ দরকার দ্রুত। আর প্রত্যাবাসন দ্রুত করতে আমাদের পক্ষ থেকে কূটনৈতিক চাপ অব্যাহত রাখতে হবে। রোহিঙ্গারা যাতে আস্থার সাথে সেখানে ফিরে যেতে পারে সেজন্যে আন্তর্জাতিক ত্রাণ কর্মী ও মানবাধিকার সংস্থাগুলোকে রাখাইন রাজ্যে কাজ করার সুযোগ দিতে হবে মিয়ানমারকে।

বিলম্বিত প্রত্যাবাসন হলে বিকল্প আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে হাতিয়ার একটি দ্বীপকে চিহ্নিত করে ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। এটা আশ্রিতদের জন্যে কতটা সহায়ক হবে আর প্রশাসনিকভাবে কতটা কার্যকর হবে তা অনেক ভাবনার আছে। কারও কারও মতে, এতে সমস্যা হতে পারে। রোহিঙ্গাদের আশ্রয় দিয়ে আন্তর্জাতিক সমাজে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি বেড়েছে। কোনো ভুল পদক্ষেপে তা বিপরীতমুখী হোক এটা কেউ চায় না। আর মিয়ানমারে রোহিঙ্গা ফেরত দেয়া অসম্ভব বা অনেক সময় সাপেক্ষবলে আমরা ভাবছি কেন? মিয়ানমার সে দেশ থেকে আগত রোহিঙ্গাদের ফেরত নেবে বলে অঙ্গীকারও করছে। সে অঙ্গীকার বাস্তবায়নের জন্যে বিশ্ব সম্প্রদায়কে নিয়ে জোরালোভাবে কূটনৈতিক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। আজ যা হচ্ছে না, আগামীকাল তা হতে পারে। পরিস্থিতিতো কিছুটা অনুকূলেই আসছে। একটি কথা আছে Realities keep changing– বাস্তবতা পরিবর্তনশীল। তবে এ পরিবর্তন আমাদের আরও অনুকূলে আনতে ও টেকসই করতে অবিরাম সক্রিয় উদ্যোগ থাকতে হবে।

পরিশেষে, একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, রোহিঙ্গা ইস্যু আমাদের জন্য একটি বড় ধরনের সমস্যা হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। অভিজ্ঞ মহলের ধারণা, এ সমস্যার আশু সমাধানের সম্ভাবনা ক্ষীণ, তাই ভবিষ্যতে এ সমস্যা আরও জটিল আকার ধারণ করতে পারে। বিশ্বের অন্যান্য প্রান্তের বিভিন্ন ঘটনাবলীর কারণে আন্তর্জাতিক মহলের দৃষ্টি অন্যদিকে সরে যেতে পারে। বাংলাদেশের পক্ষে প্রায় দশ লক্ষ শরণার্থীর চাপ সহ্য করা দুরূহ হবে। এছাড়াও রোহিঙ্গা ইস্যু ভয়াবহ নিরাপত্তাজনিত সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে। এ বিরাট উদ্বাস্তু জনগোষ্ঠীকে একটি নির্দিষ্ট জায়গায় আবদ্ধ করে রাখা প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠতে পারে। ফলে তারা জীবন-জীবিকা নির্বাহের প্রচেষ্টায় স্থানীয়দের সঙ্গে প্রতিযোগিতা, এমনকি দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়তে পারে। উপরন্তু বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গাদের কেউ কেউ নানা অপরাধ কর্মকাণ্ডে যুক্ত হতে পারে। সবচেয়ে শঙ্কার বিষয় হলো যে, চরমভাবে নিগৃহীত ও ক্ষুব্ধ এ জনগোষ্ঠীকে স্বার্থান্বেষী মহল উগ্রবাদের পথে প্ররোচিত করতে পারে, যা শুধু বাংলাদেশ নয় পুরো রিজিয়নকেই অস্থিতিশীল করে তুলতে পারে। আর এর চরম মাশুল মিয়ানমার-সহ সবাইকেই দিতে হবে। এতদসত্ত্বেও এ সমস্যাটি সমাধানের জন্য আমাদেরকে সম্ভাব্য সকল পদক্ষেপ নিতে হবে।

প্রবন্ধটি ১২ অক্টোবর ২০১৭, জাতীয় প্রেসক্লাবে 'সুজন–সুশাসনের জন্য নাগরিক' আয়োজিত গোলটেবিল বৈঠকে উত্থাপনের জন্য প্রস্তুতকৃত